শিক্ষা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঞ্জিন

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 15 October 2026, 10:52 AM | বিভাগ: ফিচার

সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা সাধারণত তার আধুনিক অবকাঠামো, দক্ষ প্রশাসন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা কিংবা বিশ্বমানের বন্দর ও আর্থিক খাতের কথা বলি। কিন্তু এসব দৃশ্যমান সাফল্যের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তিটি কয়েক দশক ধরে কাজ করছে, সেটি হলো মানুষকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করার একটি পরিকল্পিত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নব্যবস্থা।

সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশটির সাফল্যের শিক্ষা এই নয় যে বেশি মানুষকে বেশি ডিগ্রি দিতে হবে। বরং শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ে রূপান্তরিত হয়। এই জায়গাতেই শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কটি নতুনভাবে বোঝা প্রয়োজন।

শিক্ষা কি ব্যয়, নাকি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ?

একটি রাষ্ট্র যখন বিদ্যালয় নির্মাণ করে, শিক্ষক নিয়োগ দেয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কিংবা কারিগরি প্রশিক্ষণে অর্থ ব্যয় করে, তখন হিসাবের খাতায় সেটি সরকারি ব্যয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সেই অর্থ যদি একজন মানুষকে অধিক দক্ষ, উৎপাদনশীল ও উদ্ভাবনী করে তোলে, তবে সেটি আর নিছক ব্যয় থাকে না; মানবসম্পদে বিনিয়োগ-এ পরিণত হয়। সিঙ্গাপুর এই সত্যটি তার উন্নয়নের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই উপলব্ধি করেছিল। ১৯৬৫ সালে স্বাধীন হওয়ার সময় দেশটির বিশাল ভূখণ্ড, বিপুল খনিজসম্পদ কিংবা কৃষির জন্য পর্যাপ্ত জমি ছিল না। প্রচলিত অর্থে প্রাকৃতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ ছিল সীমিত। তাই দেশটির সামনে কার্যত একটি বড় সম্পদই ছিল-মানুষ। কিন্তু মানুষ নিজে থেকেই অর্থনৈতিক সম্পদ নয়। উপযুক্ত শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান, কাজের সংস্কৃতি এবং পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ কার্যকর মানবসম্পদে পরিণত হয়। সিঙ্গাপুরের উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই রূপান্তর।

আগে অর্থনীতির প্রয়োজন, তারপর সেই অনুযায়ী শিক্ষা

সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো-দেশটি শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে দুটি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র হিসেবে দেখেনি। অর্থনীতি যখন শ্রমনির্ভর শিল্পায়নের দিকে এগিয়েছে, তখন প্রয়োজন হয়েছে মৌলিক শিক্ষা ও শিল্পের উপযোগী কর্মী। উৎপাদনব্যবস্থা যখন ইলেকট্রনিকস ও উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী উৎপাদনের দিকে গেছে, তখন কারিগরি শিক্ষা, প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের গুরুত্ব বেড়েছে। পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি যখন আর্থিক সেবা, উন্নত উৎপাদন, জীবপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল সেবা এবং জ্ঞাননির্ভর শিল্পের দিকে অগ্রসর হয়েছে, তখন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকেও সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি ধারাবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে;

অর্থনীতির ভবিষ্যৎ চাহিদা → প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিতকরণ → শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ → দক্ষ মানবসম্পদ → উৎপাদনশীলতা → বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন → উচ্চতর আয়।

এখানে বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। আমরা কি শিক্ষার্থীদের প্রথমে ডিগ্রি দিচ্ছি এবং পরে তাঁদের চাকরি খুঁজতে বলছি? নাকি আগামী ১০-২০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের দক্ষতা চাইবে, সেটি আগে নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থী তৈরি করছি? এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যই ডিগ্রিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির চাহিদানির্ভর মানবসম্পদ ব্যবস্থার পার্থক্য।

ডিগ্রির সংখ্যা নয়, দক্ষতার অর্থনৈতিক মূল্য

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার নিঃসন্দেহে একটি বড় অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে,

উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং পরিবারগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রির আকাঙ্ক্ষাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখানেই আমাদের একটি কঠিন প্রশ্ন করতে হবে-একটি ডিগ্রি অর্থনীতিতে কতটা মূল্য সৃষ্টি করছে? একজন শিক্ষার্থী চার বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেন এবং একটি সনদ পেলেন; কিন্তু তাঁর অর্জিত জ্ঞান যদি শ্রমবাজারের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, যদি তিনি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারেন, সমস্যা সমাধান করতে না পারেন, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারেন কিংবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতায় দৃশ্যমান অবদান রাখতে না পারেন, তাহলে ডিগ্রির সামাজিক মূল্য থাকলেও তার অর্থনৈতিক মূল্য সীমিত হয়ে যেতে পারে। সিঙ্গাপুরের শিক্ষা দর্শন থেকে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়-শিক্ষার সমাপ্তি শুধু সনদ অর্জনে নয়; এর প্রকৃত পরিণতি সক্ষমতা অর্জনে। অর্থাৎ শিক্ষার চূড়ান্ত ফল শুধু সনদ নয়, সক্ষমতা।

কারিগরি শিক্ষাকে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষা ভাবলে চলবে না

সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং- টিভিইটি) -এর অবস্থান। আমাদের সমাজে এখনও অনেক ক্ষেত্রে এমন ধারণা রয়েছে যে সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে এবং যাঁরা সেখানে যেতে পারবে না তাঁরা কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যাবে। ফলে কারিগরি শিক্ষা অনেক সময় শিক্ষার্থীর প্রথম পছন্দের পরিবর্তে বিকল্প পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক অর্থনীতি কিন্তু এভাবে কাজ করে না। উন্নত উৎপাদন, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, রোবটপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিকস, সরবরাহব্যবস্থা, নির্মাণপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি কিংবা ডিজিটাল সেবায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী নয়, প্রয়োজন উচ্চ দক্ষতাস□পন্ন কারিগরি কর্মী ও প্রযুক্তিবিদ। সিঙ্গাপুরের কারিগরি শিক্ষা ইনস্টিটিউট (ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন-আইটিই) এবং পলিটেকনিক ব্যবস্থা এই বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে বিকশিত হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন পথের সঙ্গে শ্রমবাজার ও শিল্পের বাস্তব চাহিদার সংযোগ তৈরির চেষ্টা সেখানে সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ যদি দ্রুত শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চায়, তাহলে আমাদেরও প্রশ্ন করতে হবে-আমাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের শিল্পনীতি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে যথেষ্ট সংযুক্ত?

শিক্ষকই শিক্ষা সংস্কারের কেন্দ্র

শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা তুলনামূলক সহজ। নতুন বই লেখা যায়, নতুন বিষয় যোগ করা যায়, নতুন ভবন নির্মাণ করা যায়। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে একজন দক্ষ শিক্ষক ছাড়া এসব পরিবর্তনের অনেকটাই প্রত্যাশিত ফল দিতে পারে না। সিঙ্গাপুর শিক্ষকতার মান, শিক্ষক প্রস্তুতি এবং ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছে। এখানেও বাংলাদেশের জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে। আমরা শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়ই শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা, অবকাঠামো ও প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলি। কিন্তু একটি প্রশ্ন তুলনামূলক কম গুরুত্ব পায়-যিনি শিক্ষার্থীকে শেখাবেন, সেই শিক্ষকের নিজের জ্ঞান ও

দক্ষতা কত দ্রুত হালনাগাদ হচ্ছে? বশিষে করে কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তার (এআই) যুগে দশ বছর আগরে জ্ঞান দয়িে আগামী দশ বছররে শকি্ষার্থী তরৈি করা সম্ভব নয়। তাই শকি্ষক উন্নয়নকে বচ্ছিন্নি বা মাঝমধ্যে অনুষ্ঠতি প্রশকি্ষণ হসিবে না দখেে ধারাবাহকি পশোগত শকি্ষা ও উন্নয়নব্যবস্থা হসিবে গড়ে তুলতে হবে।

বশি্ববদি্যালয় শুধু ডগি্রি দওেয়ার প্রতষ্ঠিান নয়

একটি উন্নয়নশীল অর্থনীততিে বশি্ববদি্যালয়রে দায়ত্বি শুধু শকি্ষার্থী ভর্তি করা, ক্লাস নওেয়া, পরীক্ষা নওেয়া এবং সনদ দওেয়া হতে পারে না। বশি্ববদি্যালয়কে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে, গবষেণাকে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, শলি্পরে সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি, নতুন ব্যবসায়কি কাঠামো ও নতুন উদ্যোক্তা তরৈতিে ভূমকিা রাখতে হবে। সঙি্গাপুররে উচ্চশকি্ষা ও গবষেণা পরবিশেরে একটি বড় বশৈষ্টি্য হলো শকি্ষা, গবষেণা, উদ্ভাবন এবং শলি্পরে মধ্যে সংযোগ তরৈরি প্রচষ্টো। বাংলাদশেওে বশি্ববদি্যালয়রে সংখ্যা বৃদ্ধি পয়েছে।ে এখন পরবর্তী প্রশ্ন হওয়া উচতি- আমাদরে বশি্ববদি্যালয়গুলো কতগুলো ডগি্রি দচ্ছি,ে তার পাশাপাশি তারা বাংলাদশেরে অর্থনীততিে কতটুকু নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনরে স্বত্ব (প্যাটন্টে), নতুন উদ্যোগ (স্টার্টআপ), নীতগিত সমাধান এবং দক্ষ মানবস□পদ যোগ করছে? বশি্ববদি্যালয়রে সাফল্যরে সূচক শুধু স্নাতকরে সংখ্যা হলে শকি্ষাব্যবস্থার একটি বড় অংশ অর্থনীতরি সঙ্গে বচ্ছিন্নি থকেে যতেে পার।ে

একটি ডগি্রি দয়িে পুরো কর্মজীবন নয়

বশি্ব অর্থনীতি দ্রুত পরবির্ততি হচ্ছ।ে কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তা, স্বয়ংক্রয়ি ব্যবস্থা, রোবটপ্রযুক্তি, উপাত্ত বশি্লষেণ এবং ডজিটিাল মঞ্চ অনকে পশোর চরত্রি পরবির্তন করছ।ে আজ একজন শকি্ষার্থী যে দক্ষতা নয়িে বশি্ববদি্যালয় থকেে বরে হচ্ছনে, তার একটি অংশ হয়তো পাঁচ বা দশ বছররে মধ্যে অপ্রচলতি হয়ে যাব।ে সঙি্গাপুররে স্কলিসফউিচার উদ্যোগরে অন্তর্নহিতি দর্শন এখানইে গুরুত্বপূর্ণ- স্নাতক হওয়ার সঙ্গে শখোর সমাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ শকি্ষার একটি শষে তারখি নইে। বাংলাদশেওে আমাদরে শকি্ষা ধারণাকে বদি্যালয় □ কলজে □ বশি্ববদি্যালয় □ চাকরি এই সরল রখো থকেে বরে করে আনতে হব।ে তার পরবির্তে প্রয়োজন;

শকি্ষা □ কর্মসংস্থান □ পুনঃদক্ষতা অর্জন □ কর্মসংস্থান □ দক্ষতা উন্নয়ন □ উদ্ভাবন □ আজীবন শকি্ষা মানুষ তাঁর কর্মজীবনে বারবার শখিব,ে দক্ষতা পরবির্তন করবে এবং নতুন প্রযুক্তরি সঙ্গে নজিকেে অভযিোজতি করব।ে

শকি্ষা থকেে জাতীয় আয়-সংযোগটি কোথায়?

এই আলোচনার সবচয়েে গুরুত্বপূর্ণ বষিয় সম্ভবত এটইি। শুধু শকি্ষতি মানুষরে সংখ্যা বাড়লইে একটি দশে

ধনী হয় না। শিক্ষাকে কয়েকটি মধ্যবর্তী ধাপ অতিক্রম করে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হতে হয়।

মানসম্মত শিক্ষা → প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও দক্ষতা → কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সক্ষমতা → শ্রম উৎপাদনশীলতা → প্রযুক্তি গ্রহণ ও উদ্ভাবন → উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী শিল্প → রপ্তানি ও বিনিয়োগ সক্ষমতা → উচ্চতর আয় → জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

অর্থাৎ শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাঝখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি হলো উৎপাদনশীলতা। একজন মানুষের শিক্ষার কারণে যদি তাঁর উৎপাদনশীলতা না বাড়ে, তাহলে, শিক্ষার অর্থনৈতিক প্রতিদান সীমিত থাকবে। আর লক্ষ লক্ষ মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়লে সেটিই সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন, আয় এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় প্রতিফলিত হতে পারে। এই জায়গাটিই বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুরকে অনুকরণ নয়, নীতিটি বুঝতে হবে

এখানে সতর্ক থাকা জরুরি। সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশ এক নয়। সিঙ্গাপুর একটি ছোট নগররাষ্ট্র; বাংলাদেশের রয়েছে প্রায় ১৭ কোটির বিশাল জনগোষ্ঠী, বৃহৎ গ্রামীণ অর্থনীতি, ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো এবং ব্যাপক আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য। তাই সিঙ্গাপুরের মডেল সরাসরি বাংলাদেশে

অনুলিপি করা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের মূল নীতি থেকে শিক্ষা নেওয়া সম্ভব। আর সেই নীতি হলো-শিক্ষানীতি এবং অর্থনৈতিক নীতিকে একই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সামনে রেখে পরিচালনা করা। বাংলাদেশ যদি অর্ধপরিবাহী প্রযুক্তি (সেমিকন্ডাক্টর), ইলেকট্রনিকস, ওষুধশিল্প, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, সরবরাহ ও পরিবহনব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব শিল্প, উন্নত বস্ত্রশিল্প কিংবা জ্ঞানভিত্তিক সেবায় আগামী দুই দশকে শক্তিশালী হতে চায়, তাহলে আজকের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেই ভবিষ্যতের প্রতিফলন থাকতে হবে। কারণ ২০৪১ সালের কর্মশক্তি ২০৪১ সালে তৈরি করা যাবে না। তাদের একটি বড় অংশ আজই আমাদের স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য সাতটি শিক্ষা

সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতিগত শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত, শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় অর্থনৈতিক ও শিল্প কৌশলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্রমকে ডিগ্রিকেন্দ্রিক না রেখে দক্ষতা ও সক্ষমতাকেন্দ্রিক করতে হবে। তৃতীয়ত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মর্যাদাপূর্ণ এবং শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত কর্মজীবনের পথ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। চতুর্থত, শিক্ষক উন্নয়নকে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের অংশ করতে হবে। পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প-সরকার সহযোগিতা বাড়িয়ে গবেষণাকে উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

ষষ্ঠত, কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তা, উপাত্ত, ডজিটিাল প্রযুক্ত িএবং উদীয়মান প্রযুক্তকিে সব শাখার শক্ষিার্থীর ভবষ্যিৎ কর্মদক্ষতার অংশ হসিবে দেখেতে হবে। সপ্তমত, আজীবন শক্ষিা, পুনঃদক্ষতা অর্জন এবং দক্ষতা উন্নয়নরে একট িজাতীয় পরবিশে গড়ে তুলতে হবে। এসবরে কন্দ্রেবন্দিুতে একট িপ্রশ্নই থাকতে হবে-আমরা কতজন স্নাতক তরৈ িকরছ,ি সটে িনয়; আমরা কতজন অর্থনতৈকিভাবে সক্ষম মানুষ তরৈ িকরছ?ি

বাংলাদশেরে সবচয়েে বড় স□পদও মানুষ

বাংলাদশেরে প্রাকৃতকি সম্পদ সীমতি হতে পারে, কন্তিু আমাদরে রয়ছেে বপিুল জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে আমরা প্রায়ই আমাদরে শক্ত িহসিবে বর্ণনা কর।ি কন্তিু জনসংখ্যা নজিে থকেইে জনমতিকি লভ্যাংশ (ডমেোগ্রাফকি ডভিডিন্ডে) নয়। অদক্ষ জনগোষ্ঠী অর্থনতৈকি চাপ সৃষ্ট িকরতে পারে; দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীই প্রকৃত জনমতিকি লভ্যাংশ। এখানইে সঙ্গিাপুররে অভজ্ঞিতা বাংলাদশেরে জন্য সবচয়েে প্রাসঙ্গকি। সঙ্গিাপুর আমাদরে শখোয় যে একট িদশেরে শক্ষিাব্যবস্থার সাফল্য শুধু কতজন স্কুলে গলে, কতজন বশি্ববদ্যিালয়ে ভর্ত িহলো কংিবা কতজন ডগ্রি িপলে-এসব দয়িে বচিার করলে চলবে না। শষে পর্যন্ত দখেতে হবে সইে শক্ষিা মানুষরে উৎপাদনশীলতা কতটা বাড়য়িছে,ে প্রযুক্ত িব্যবহাররে সক্ষমতা কতটা সৃষ্ট িকরছ,ে উদ্ভাবন কতটা উৎসাহতি করছে এবং জাতীয় অর্থনীততিে কতটা নতুন মূল্য সংযোজন করছে। বাংলাদশে ইতোমধ্যে শক্ষিার বস্তিারে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগত িঅর্জন করছে। এখন প্রয়োজন বস্তিার থকেে রূপান্তররে দকিে যাওয়া-সংখ্যা থকেে মান,ে সনদ থকেে সক্ষমতায় এবং শক্ষিা থকেে উৎপাদনশীলতায়। সঙ্গিাপুররে সাফল্যরে সবচয়েে বড় শক্ষিা তাই হয়তো কোনো নর্িদষ্টি বশি্ববদ্যিালয়, শক্ষিাক্রম বা শক্ষিা প্রকল্প নয়। শক্ষিা হলো একট িদশেরে দীর্ঘময়োদ িঅর্থনতৈকি কৌশলরে অংশ-এই উপলব্ধ।ি

আমাদরেও এখন প্রশ্ন করার সময় এসছে:ে আমরা ক িশুধু শক্ষিতি জনগোষ্ঠী তরৈ িকরতে চাই, নাক িএমন মানবস□পদ তরৈ িকরতে চাই যাঁরা বাংলাদশেরে অর্থনীতকিে পরবর্তী স্তরে নয়িে যাব?ে যদেনি আমাদরে শক্ষিাব্যবস্থার প্রতটি িস্তরে এই প্রশ্নরে উত্তর স্পষ্ট হব,ে সদেনি শক্ষিা আর শুধু একট িসামাজকি খাত থাকবে না-শক্ষিাই হয়ে উঠবে বাংলাদশেরে অর্থনতৈকি উন্নয়নরে সবচয়েে শক্তশিালী ইঞ্জনি।

© 2026 আপনার নউিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনট িআমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।ে